শিক্ষার সঙ্কট

আধুনিক শিক্ষা বলতে যা বোঝায় সে জিনিস ইউরোপ থেকে ভারতে এসেছে। ইউরোপেও তার সূত্রপাত বেশিদিন আগে নয়। এখানের মতো সেখানেও ইতর সাধারণের জন্যে ছিল একটু পড়তে শেখা, একটু লিখতে শেখা, একটু যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে শেখা। আর ব্রাহ্মণ বা পাদ্রির জন্যে শাস্ত্রাধ্যয়ন। ইতর সাধারণ শিখত মাতৃভাষায় আর ব্রাহ্মণ বা পাদ্রিরা সংস্কৃত বা ল্যাটিন ভাষায়। উচ্চশিক্ষা আর নিম্নশিক্ষার মাঝখানে ছিল অলংঘ্য প্রাচীর।

ব্যতিক্রম হিসাবে ছিল আরো এক প্রকার শিক্ষা। সেটা হতো বড়োলোকদের বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কল্যাণে। পাঠশালায় বা টোলে বা পাদ্রিদের স্কুল কলেজে তার জন্যে ব্যবস্থা ছিল না। থাকলেও গৌণভাবে। সেটা হলো কাব্যপাঠ বা ক্লাসিক চর্চা। সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রিক ভাষায়। রাজসভার সভাসদ বা অভিজাত শ্রেণীর দু চারজন ব্যক্তি বহুব্যয়ে কালিদাস বা ভবভূতি, ভার্জিল বা অ্যারিস্টটল পড়তেন। রাজসভায় বা জমিদারের বৈঠকখানায় তা নিয়ে আলাপ আলোচনাও হতো।

ইউরোপে যখন ছাপাখানার প্রবর্তন হয় তখন শাস্ত্র অশাস্ত্র সবরকম কেতাব স্বল্পমূল্যে পাওয়া যায়। কেনে যারা তারা দোকানদার কারিগর শ্রেণীর লোক। ততদিনে শহরের বিস্তার, বাণিজ্যের বিস্তার হয়েছিল। রাজারাজড়া নয়, অভিজাত নয়, ব্রাহ্মণ বা পাদ্রি নয়, এমন কতক লোক মুদ্রিত পুস্তক কেনে ও পড়ে। সেইভাবে ঘরে ঘরে বিদ্যাবিস্তার হয়। বলা বাহুল্য ধর্মগ্রন্থেরই চাহিদা ছিল বেশি, কিন্তু গ্রিক ল্যাটিন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তিও বহুল প্রচারিত হয় ও তার ফলে রেনেসাঁস ঘটে। বিজ্ঞানচর্চাও বেড়ে যায়। বিচিত্র বিষয়ের চাহিদা যখন দেখা দিল যোগানও সেইসঙ্গে উপস্থিত হলো। পাদ্রিদের প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে কাব্যচর্চা দর্শনচর্চা আইনচর্চা ও পরে বিজ্ঞানচর্চা প্রবর্তিত হলো। ধীরে ধীরে সেসব প্রতিষ্ঠান সেকুলার হয়ে গেল। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধেও ল্যাটিন না জানলে ও বাইবেল পড়া না থাকলে অক্সফোর্ডে বা কেমব্রিজে ঢুকতে দিত না।

যে শিক্ষা সমাজের ঊর্ধ্বতন স্তরে আবদ্ধ ছিল সে শিক্ষা মধ্যবর্তী স্তরেও ছড়িয়ে যায়। যে কোনো মধ্যবিত্ত ব্যক্তি ইচ্ছামতো বই কিনতে পারেন, না পারলে লাইব্রেরিতে পড়তে পান। মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রের গ্রাহক হয়েও সেইসূত্রে জ্ঞানলাভ করেন। দৈনিকপত্রের পাঠক হন। শিক্ষিত বলে গণ্য হতে হলে রাজারাজড়া বা সভাসদ্ বা বড়োলোক হতে হবে, অথবা হতে হবে পাদ্রি, এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না। এই অধ্যায়ে ইউরোপের নবপর্যায়ের শিক্ষা ভারতেও প্রবর্তিত হয়, তারপরে অন্যান্য দেশেও। এখন তো দুনিয়ার সর্বত্র সেই ধরনের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি, তেমনি সেকুলার।

ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটে যায়। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য দেশেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। তখন এতকাল যাদের ইতর সাধারণ বলে শুধু একটু পড়তে বা লিখতে বা অঙ্ক কষতে শেখানো হতো তাদের মধ্যেও বিদ্যাবিস্তারের প্রশ্ন ওঠে। তারাও আরো কম দামের বই কাগজ কেনে। বিশেষত নভেল বা রোমান্স। জাপানের দৈনিক পত্রিকায় ইতরজন পাঠ্য অলীক কাহিনী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ইতরজন পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাশীলরা ফতোয়া দেন যে ইতর ভদ্র সবাইকে স্কুলে পাঠাতে হবে, না পাঠালে বাধ্য করা হবে। তবে স্কুলের পর কলেজে পাঠাবার জন্যে তেমন কেউ ব্যস্ত ছিলেন না। কলেজ হবে সর্বসাধারণের জন্যে নয়, মধ্যবিত্তদের বা ঊর্ধ্বতন স্তরের জন্যে। ইউনিভার্সিটিও তাই। সেক্ষেত্রে বাধ্যতার প্রশ্ন ওঠে না।

সেই যে একটু পড়ানো, একটু লেখানো, একটু আঁক কষানো সেটা এখন উন্নত দেশগুলির শিক্ষাব্যবস্থার নিম্নতম স্তরেও অপ্রচলিত। ওইটুকু শিক্ষা দিয়ে কোনো নাগরিককেই বিদায় দেওয়া হয় না। তার ইচ্ছা থাক আর নাই থাক তাকে চোদ্দ বছর বা ষোলো বছর বা আঠারো বছর পর্যন্ত অনেক রকম বিদ্যা শেখাতেই হবে। তবে তাকে কলেজে যেতে বাধ্য করা হবে না। কলেজের বিকল্পও আছে। যেখানে সে কারিগরি শিখতে পারে, মিলিটারি ট্রেনিং পেতে পারে, ব্যবসাবাণিজ্যের জন্যে তালিম পেতে পারে। তবে মুখ্য স্রোতটা কলেজমুখী। কলেজে যারা যেতে চায় তারা যোগ্য হয়ে থাকলে সরকারি বেসরকারি স্কলারশিপ পায়। অক্সফোর্ড কেমব্রিজের শতকরা আশিজন ছাত্রই নাকি স্কলারশিপের টাকায় পড়াশুনা চালায়। নইলে ঘরের খরচে পড়া অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।

উন্নত দেশগুলিতে যে প্যাটার্ন লক্ষিত হচ্ছে তা অল্প কথায় এই যে, স্কুলের শিক্ষা হবে সর্বজনীন ও বিনামূল্যে লভ্য। কলেজের শিক্ষা হবে অধিকাংশ ছাত্রের অধিগম্য, কিন্তু বিনামূল্যে নয়। হয় ঘরের টাকায় নয় স্কলারশিপের টাকায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অপেক্ষাকৃত কম ছাত্রের জন্যে। তাদের বেশিরভাগই স্কলারশিপ পায়।

উন্নত দেশ বললে এটাও বোঝায় যে তার অর্থনীতি শিক্ষার ব্যয় বহন করতে সক্ষম। যেখানে অক্ষম সেখানে হয় নিম্নশিক্ষা নয় অবহেলিত হয় উচ্চশিক্ষা। আমাদের এ দেশে এখনো নিরক্ষরের অনুপাত ভয়াবহ। বোধহয় শতকরা সত্তর। স্কুলের প্রাথমিক সোপানও সর্বজনীন নয়, বাধ্যতার প্রশ্নও ওঠে না। আমাদের ধনবল যেমন কম তেমনি উপযুক্ত শিক্ষকেরও অপ্রাচুর্য। একটু পড়াতে, একটু লেখাতে, একটু কষাতে সকলেই পারেন, কিন্তু তার চেয়ে বেশি পারতে হলে নিজেকেই ট্রেনিং নিতে হবে। কোথায় এত ট্রেনিং পাওয়া শিক্ষক?

স্কুলের শিক্ষা যদি কাঁচা থেকে যায় তবে সেইসব কাঁচা ছাত্রদের কলেজে ঢুকতে দেওয়াই ভুল। কিন্তু তারা যাবেই বা কোথায়! কলেজের যতগুলো বিকল্প অন্যান্য উন্নত দেশে দেখা যায় এ দেশে ততগুলো নয়। আর দেখা গেলেই বা কী? যারা কলেজের পক্ষে কাঁচা তারা তার বিকল্পগুলির পক্ষেও অনেক সময় কাঁচা।

স্কুলের শিক্ষার সংস্কার না করে কলেজের শিক্ষার সংস্কার যে গোড়া কেটে আগায় জল। অনুপযুক্ত ছাত্রদের দিয়ে একটি কি দুটি বাদে প্রায় প্রত্যেকটি কলেজ ভরে গেছে। তারা গায়ের জোরে ডিগ্রি আদায় করতে পারে, কিন্তু ডিগ্রিলাভ আর শিক্ষালাভ তো একই জিনিস নয়। ডিগ্রিলাভ করে তারা যে চাকরিবাকরির যোগ্য হবে এটা তাদেরি মনের মরীচিকা। গায়ের জোরে হয়তো চাকরিও আদায় করবে ও তাতে টিকেও থাকবে,

কিন্তু জনসাধারণকে তাদের প্রদত্ত করের বিনিময়ে সেবা দিতে পারবে না। জনসাধারণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রক্ত জল করে যে ট্যাক্স জোগাবে তা দিয়ে লক্ষ লক্ষ সাদা হাতি পোষা হবে। আজ আমরা ছাত্রবিদ্রোহ দেখছি, কাল আমরা গণবিদ্রোহ দেখব।

যে ট্যাক্স যোগায় সেই হচ্ছে আসল মালিক। তার সেবার জন্যেই সরকারের এতগুলো বিভাগ। সে যদি দেখে যে এসব বিভাগের উদ্দেশ্য জনসেবা নয়, শ্বেতহস্তী পোষণ, মধ্যবিত্তশ্রেণীর অপদার্থ সন্তানদের বোঝা বহন, তা হলে সে সত্যি সত্যি বাসুকির মতো মাথা ঝাড়া দেবে আর ঘটে যাবে একটা ভূমিকম্প। ধনিকদের বিতাড়ন করে মধ্যবিত্তদের তাদের জায়গায় বসানোই বিপ্লবের শেষ কথা নয়। সে অধ্যায়ের পর আরো অধ্যায় আছে।

এখানে পরিষ্কার করে বলি যে আগেকার দিনে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা, জীবিকা উপার্জন নয়। কিন্তু এখনকার দিনে জীবিকা উপার্জনও শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকের বেলা একমাত্র উদ্দেশ্য। জীবিকাকে শিক্ষার বাইরে রাখা আজকের দিনে আর সম্ভব নয়। শিক্ষার ব্যবস্থা যাঁরা করবেন জীবিকার ব্যবস্থাও তাঁদেরকেই করতে হবে। কিন্তু এ প্রস্তাবে সরকার এখনো রাজি নন।

গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হয় তখন ইংরেজদের মধ্যেই অনেকে এর বিরুদ্ধতা করেন। তাঁদের একভাগ বলেন প্রাচ্য শিক্ষাই ভারতের আদর্শ, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হলে আদর্শভ্রংশ ঘটবে, আদর্শভ্রংশ ঘটলে একূল ওকূল দু কূল যাবে, সেটা কি ভালো হবে? আরেক ভাগ বলেন, ইংরেজি শিক্ষা পেয়ে এরা চাইবে ইংরেজের মতো চাকরি, কোথায় এত চাকরি? চাকরি না পেলে এরা অসন্তুষ্ট হবে, কেমন করে রোধ করা যাবে এদের অসন্তোষ? যে শিক্ষা প্রবর্তিত হলে বেকার সমস্যা অবশ্যম্ভাবী সে শিক্ষা প্রবর্তন করা মানেই তো যে সমস্যা নেই তাকে সৃষ্টি করা।

ইংরেজি শিক্ষার স্বপক্ষে যাঁরা ছিলেন তাঁরাই জিতলেন। মেকলের কাস্টিং ভোটের জোরে। মেকলের উদ্দেশ্য ছিল একটি ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও প্রভাববিস্তার। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ তাঁকে ক্রমে ক্রমে ইংরেজবিরোধী করে তোলে। সেই শ্রেণীর নেতৃত্বেই ইংরেজ রাজত্ব হটে যায়। বাহাদুর শা জাফর বা নানাসাহেবের নেতৃত্বে নয়। তারপরে সেই শ্রেণীই এখন ব্রিটিশবর্জিত ভারতের হর্তাকর্তা হয়ে বসেছে। সঙ্গে সঙ্গে বলছে সে আর ইংরেজি শিখবে না, তার বদলে শিখবে হিন্দি ইত্যাদি ভাষা। যেন ইংরেজি শিক্ষা কেবল ভাষাশিক্ষার ব্যাপার।

ইংরেজি শিক্ষা বলতে তখনো বোঝাত, এখনো বোঝায়, আধুনিক পদ্ধতির শিক্ষা। যাতে স্কুল আছে, কলেজ আছে, বিশ্ববিদ্যালয় আছে। যাতে বিজ্ঞান আছে, পাশ্চাত্য দর্শন আছে, ইতিহাস ভূগোল আছে। যাতে ম্যাট্রিকুলেশন আছে, বি. এ. আছে, এম. এ. আছে। এটা এখন সারা দুনিয়ার পদ্ধতি। এ সব ডিগ্রি এখন আন্তর্জাতিক মান নির্ণয়ের দণ্ড। তুমি তোমার খুশিমতো ডিগ্রি বিতরণ করতে পারো, কিন্তু তোমার ডিগ্রিধারীরা অন্যত্র স্বীকৃতি পাবে না। তোমার কাছেই ফিরে আসবে আর তোমারই শিলনোড়া দিয়ে তোমারি দাঁতের গোড়া ভাঙবে। আমাদের আজকের শিক্ষাব্যবস্থা ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক ধারা ধরে অনেক দূর এগিয়ে গেছে, একে আর কোনোমতেই পিছু হটানো যাবে না।

আন্তর্জাতিক মানই এখন অন্তর্ভারতীয় মান। ভারতের জন্যে আলাদা একটা পদ্ধতি প্রণয়নের প্রত্যেকটি চেষ্টাই নিষ্ফল হয়েছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের, তেমনি গান্ধীজির,

তেমনি গুরুকুলের, তেমনি স্বদেশিযুগের ন্যাশনাল কাউন্সিলের। দেশের লোক গ্রহণ করেনি কিংবা গ্রহণ করলেও সার গ্রহণ করেনি, খোসা গ্রহণ করেছে। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির অসংখ্য দোষত্রুটি গত সত্তর বছর ধরে সর্বত্র আলোচিত হয়েছে, অথচ আজকাল গ্রামে গ্রামে ইংরেজি মডেলের স্কুল কলেজ গজিয়ে উঠছে। গড্ডলিকার মতো ছেলেমেয়েরা ছুটেছে সেখানে। জানে বেকার হবে, কোথাও পাত্তা পাবে না, তবু একটা সার্টিফিকেট বা একটা ডিগ্রি তাদের চাই। আর কিছু না হোক সমাজে তো মান বাড়বে। লোকে তো শিক্ষিত বলে সমীহ করবে। ফেল করলেও তো বলতে পারা যাবে, আমি কলেজে পড়েছি।

এর প্রসার কেউ রোধ করতে পারবে না। কারণ মানুষমাত্রেই সমাজে উঠতে চায়। একটি ডোম আমার কাছে মোড়া বেচতে আসত। সেও কথায় কথায় ইংরেজি বুকনি দিত। আমি তাকে যতই বাংলা প্রতিশব্দ শোনাই সে ততই ইংরেজি বিদ্যা ফলায়। এর কারণ সেও বোঝাতে চায় যে সে সাধারণ ডোম নয়, শিক্ষিত ভদ্রলোক হতে তার সাধ।

একবার ইংরেজি শিক্ষার স্বাদ পেলে গ্রামের ছেলে আর গ্রামে ফিরে যায় না, চাষীর ছেলে আর চাষে ফিরে যায় না। সকলেই চায় শহুরে ভদ্রলোক হতে। ইংরেজি শিক্ষার বদলে যেসব প্রদেশে হিন্দি শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে সেসব রাজ্যেও একই হাল। বিহারের দেহাতি ছেলেদের লক্ষ্য চাপরাশি বা পিয়ন হওয়া, দু পয়সা উপরি রোজগার করা ও শিক্ষিত ভদ্রলোক বলে গণ্য হওয়া। তাতে তাদের সামাজিক মর্যাদা বেড়ে যায়। বিয়েতে বিহারীরা পণ নিত না বাঙালিরা নিত বলে রাজেন্দ্রপ্রসাদজি একবার বাঙালিদের উপর একহাত নিয়েছিলেন। 'এই দেখ, বাঙালিরা শিক্ষাদীক্ষার এত গর্ব করে, তবু পণ সমস্যার সমাধান করতে পারল না, আর আমরা মুখ্যু বিহারী, আমাদের মধ্যে ও পাপ নেই।' কিন্তু ইদানীং লেখাপড়া শিখে ইতর ভদ্র সকলেই পণ নিতে শুরু করেছে তাঁর সাধের বিহারে। আমার চাকর বলছিল যে আজকাল সাইকেলে কুলোয় না, মোটর সাইকেল দিতে হয় জামাইকে।

শিক্ষা, তা সে সেকালের ইংরেজি শিক্ষাই হোক আর একালের হিন্দি শিক্ষাই হোক, ছাত্রদের পল্লীবিমুখ ও কায়িক শ্রমবিমুখ করে। আর তাদের শিক্ষিত ভদ্রলোকে পরিণত করে। সেইসঙ্গে এনে দেয় এমন এক স্বাচ্ছন্দ্যের মান যার খরচ জোগাতে না পেরে তারা ধরে ঘুষ, দাবি করে পণ, অল্পে সন্তুষ্ট হয় না। রাজেন্দ্রপ্রসাদজি বেঁচে থাকতেই এ পতন শুরু হয়েছিল। দুঃখের বিষয় মুসলিম সমাজেও শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পণপ্রথার প্রসারও দেখা যাচ্ছে।

এখনো দুধে হাত পড়েনি। শতকরা সত্তরজন ভারতীয় এখনো নিরক্ষর। তাদের ধরেবেঁধে স্কুলে পাঠাবার পর দেখা যাবে যে তারাও চায় শিক্ষিত ভদ্রলোক হতে, শহরে বাস করতে ও দু হাতে রোজগার করতে। সেসব পন্থা যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তবে তারাও ধর্মঘট করবে, কাজকর্ম বন্ধ করবে। তাদের মধ্যে যারা চরমপন্থী তারা বোমাও ফাটাবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর হামলাও করবে। পরীক্ষার হলে নকল করার অধিকার দাবি করবে। পাশ সবাইকে করিয়ে দিতে হবে, ডিগ্রি সবাইকে পাইয়ে দিতে হবে, চাকরি সবাইকে জুটিয়ে দিতে হবে। পরে পণ ইত্যাদি ওরা আপনি আদায় করে নেবে।

একই ব্যাপার চলেছে ইউরোপে। সেখানে আর গ্রামে ফিরে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। গ্রাম ক'টাই বা আছে! শহর এখন প্রকাণ্ড হাঁ করে গ্রামের দিকে তেড়ে যাচ্ছে। সেখানে

সবাই চায় শহরে বা শহরতলিতে থেকে মোটর হাঁকিয়ে আপিসে বা কারখানায় যেতে, বাড়ি ফিরে টেলিভিসন দেখতে। ওরা উপরি নেয় না, বাড়তি খাটুনির জন্যে ওভারটাইম নেয়। ইউরোপেও আজকাল মাওবাদীর আবির্ভাব হয়েছে। সমাজসুদ্ধ সবাই বুর্জোয়া হয়ে যাচ্ছে দেখে এরা তাদের উদ্ধার করতে চায়। তা ছাড়া কতক লোক হিপি হয়ে গিয়ে প্রকারান্তরে প্রতিবাদ জানাচ্ছে এই বলে যে ধরেবেঁধে স্কুলে পাঠানো, কারখানায় পাঠানো, যুদ্ধে পাঠানো বস্তুগতভাবে লাভজনক হলেও নীতিগতভাবে লাভজনক নয়। যেখানে কলকারখানা ভিন্ন অন্য জীবনোপায় নেই সেখানে কলকারখানায় সবাই স্বেচ্ছায় যায় না। অনেকে নিরুপায় হয়েই যায়। সেটাও একপ্রকার ধরেবেঁধে পাঠানো। যুদ্ধে তো আইন করে ধরেবেঁধে পাঠানো হয়ই।

পাশ্চাত্য সভ্যতা যেমন অপরিমিত সুখস্বাচ্ছন্দের সত্র খুলে দিয়েছে তেমনি তার অলিখিত শর্ত হচ্ছে সবাইকে কনফর্ম করতে হবে। এত বেশি কনফর্ম করলে মৌলিকতা বলে কিছু থাকে না। সমাজে বিদ্রোহের কারণ থাকলে ছাত্রদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। ওরাই সকলের আগে প্রতিরোধ করে। পঠদ্দশার পর ছাত্ররা সবাই একভাবে না একভাবে নিযুক্ত হয়। জীবিকা সকলেরই জোটে। কিন্তু তাতে তারতম্য আছে। বিজ্ঞানী বা টেকনোলজিস্টদের যা কদর সাহিত্যের বা ইতিহাসের বা দর্শনের কৃতী ছাত্রদের তা নয়। সিভিল সার্ভিসে যারা যায় তাদের চেয়ে অনেক বেশি পায় যারা সওদাগরি প্রতিষ্ঠানে যায়। শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা সেদেশেও হালে পানি পায় না। অথচ তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর আয় বেড়েই চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে চালও। আর বড়োলোকদের তো কথাই নেই। তা হলে আর সামাজিক সাম্য কোথায়?

এইসব কারণে সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্ন ওঠে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণেও অনর্থ সৃষ্টি করে। সমাজের কাঠামো পাল্টানো মুখের কথা নয়। যুদ্ধ আর বিপ্লব মিলে সাহায্য না করলে পরিবর্তন যা হয়েছে তাও হতো না। বিপ্লব বলতে শিল্পবিপ্লবও বোঝায়। পাশ্চাত্য সভ্যতা সচ্ছল হলেও সুস্থ নয়। ওরাও বলছে যে ওদের সমাজ অসুস্থ সমাজ। শিক্ষায় তার প্রতিফলন পড়বেই। তা ছাড়া জীবনের সর্বত্র প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাচ্ছে যত লোক হটে যাচ্ছে তার শতগুণ। এই যে 'ইঁদুরের দৌড়' এটা শিক্ষার ক্ষেত্রেও অশান্তি ডেকে এনেছে।

তা বলে আমাদের এ দেশের মতো অরাজকতা নয়। আমরা এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি যা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রকেও করেছে অরাজক। বরঞ্চ আরো কিছু বেশিরকম অরাজক। কেরানিদের তবু একটা ভবিষ্যৎ আছে, ছাত্রদের কী ভবিষ্যৎ? ভালো পাশ করলেও কি ভালো চাকরির স্থিরতা আছে? তা ছাড়া পড়ানো যা হয় তা নমো নমো করে হয়। পরীক্ষাগুলো ভীতিপ্রদ ব্যাপার। ছাত্রদের বেলা যা জীবনমরণ সমস্যা অধ্যাপকদের বেলা তা ছেলেখেলা। খালি ছাত্রদের দোষ দিয়ে কী হবে? শিক্ষকদেরই অগ্রণী হয়ে ছাত্রদের অন্তর জয় করতে হবে। কিন্তু নাই দিয়ে নয়।

ইউরোপে পরিকল্পিত এই শিক্ষাব্যবস্থা একদা নির্দিষ্টসংখ্যক উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের ছেলেদের জন্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর যখন ভারতে প্রবর্তিত হয় তখনো তেমনি উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ঘরের নির্দিষ্টসংখ্যক ছাত্রের জন্যেই। কেউ তখন কল্পনা করতে পারেনি যে স্কুলকলেজের সংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যা এত বেশি বেড়ে যাবে। এমনকি এই শতাব্দীর গোড়ার দিকেও না। স্যার আশুতোষ তাঁর গ্রাজুয়েট তৈরির কারখানায় যে

ওভার-প্রোডাকশন ঘটান অনেকে তার জন্যে তাঁর নিন্দাবাদ করেছে। এখন তো আরো অনেক কারখানা স্থাপন করা হয়েছে কাঁহা কাঁহা মুলুকে। সেসব কারখানা আরো বেশি মাল উৎপাদন করছে। আরো বেশি নিরেশ মাল। হিন্দি বাংলা তামিল লেবেল আঁটা। এই সর্বব্যাপী অতি উৎপাদন রোধ করবে কে? সরকারেরই বা সে সাধ্য কোথায়?

মাও ৎসে তুং এর একটা সমাধান দেখিয়েছেন। কিন্তু আমরা যদি তাঁর অনুসরণ করতে যাই ব্যর্থ হব। বিপ্লবী সরকার না হলে অতখানি কঠোর আর কেউ হতে পারে না। হতে গেলে গণেশ ওলটাবে। চেয়ারম্যান মাও শহর পছন্দ করেন না, ভদ্রলোক পছন্দ করেন না, শহুরে ভদ্রলোক উৎপন্ন যাতে না হয় তার মূলোচ্ছেদ করতে চান। ছেলেরা চালান যায় গ্রামে আর সেখানে চাষ করতে শেখে। ঠিক যেন গান্ধীজির বুনিয়াদি শিক্ষা। আমরা গান্ধীকে সরিয়েছি, মাওকে ডেকে আনতে পারিনে। অথচ অরাজকতায় দিশেহারা হচ্ছি। বোমার সঙ্গে মোকাবিলা করার বরাত দিয়েছি পুলিশের উপরে।

তলিয়ে ভাবতে হবে আমাদের। চোখ বুজে পশ্চিমের অনুসরণ করলে চলবে না। একদিন অতি সঙ্গত কারণেই পশ্চিমের পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলুম। সে পদ্ধতি বাতিল করার মতো কারণ দেখছিনে। কিন্তু যে পদ্ধতি সমাজের ক্ষুদ্র একটি স্তরের পক্ষে ভালো সেই পদ্ধতিই যে সর্বসাধারণের পক্ষেও ভালো এ যুক্তি মেনে নিলে কোনো পক্ষেরই মঙ্গল হবে না। যে যেমন শিক্ষার যোগ্য সে তেমন শিক্ষা পাবে। যে কলেজে পড়ার যোগ্য নয় সে কলেজে যাবে না, আর কোথাও যাবে। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার যোগ্য নয় সে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে না, আর কোথাও যাবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যা সীমাবদ্ধ না করে উপায় নেই। যোগ্যতার টেস্ট স্কুলেও প্রয়োগ করতে হবে। যোগ্যাযোগ্য বিনিশ্চয় অপ্রীতিকর। কিন্তু তা না করলে যা হবে তা মাওবাদী ব্যবস্থা। মাঠে-ময়দানেই পাঠাতে হবে অধ্যাপক ও ছাত্রদের। আমরা যদি মেরুদণ্ডের পরিচয় না দিই ইতিহাস সেই অভিমুখেই যাত্রা করবে। আজ আমরা নিজেরাই পরীক্ষাধীন। আমার মনে হয় অধিকাংশ ছাত্রকে ষোল বছর বয়সের পর যে কোনো প্রকার জীবিকায় ভর্তি করে দিতে হবে। উচ্চশিক্ষা তারা চায় তো অবসর সময়ে প্রাইভেট ছাত্র রূপে পাবে।

শিক্ষার আদি উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন, তার সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে জীবিকার্জন। কালক্রমে জ্ঞানার্জনের চেয়ে বড়ো হয়েছে জীবিকার্জন। জ্ঞানবানরা এখন দেশ ছেড়ে বিদেশে প্রস্থান করছেন আরো উপার্জনের আশায়। ইংলণ্ডের বিদ্বানদের লক্ষ্য আমেরিকা। ভারতীয় বিদ্বানদের লক্ষ্য ইংলণ্ড, আমেরিকা, কানাডা। এর নাম ব্রেন ড্রেন। একে থামাতে গেলে বহু বিদ্বান ব্যক্তির উপর অবিচার করা হয়। অনেকে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় যথাযোগ্য স্থান পেলে থেকে যেতেন। যথাযোগ্য দূরের কথা ন্যূনতম স্থানও পাননি। সে ব্যবস্থা এমন সব লোকের হাতে পড়েছে যাঁরা আপনজন ছাড়া আর কাউকে চান না। কাজেই আপনার স্থান খুঁজতে হয় বিদেশে অনাত্মীয় জনদের মধ্যে। মিলেও যায়। আমি এই ব্রেন ড্রেনের নিন্দা করি কোন মুখে যখন দেখি যে যোগ্যতর উপেক্ষিত হচ্ছে, কম যোগ্য খুঁটির জোরে ঘাঁটি গেড়ে বসছে! আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এমন একটা আস্তাবল যাকে সাফ করতে হলে একাধিক হারকিউলিসের দরকার। এই শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে আনলে হয়তো সেটা সুগম হবে। অপরপক্ষে যেখানে যেটুকু ভালো কাজ হচ্ছে কেন্দ্রের চাপে সেটুকুরও ক্ষতি হতে পারে।

শিক্ষাব্যবস্থার স্তরে স্তরে এত অন্যায়, এত অবিচার জমেছে যে সমর মতো প্রতিকার না করলে এর নৈতিক ভিত্তিটাই ধসে পড়বে। কেবলমাত্র ইনটেলেকচুয়াল প্রয়োজন মেটানোর জন্যেই স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি নয়। মনুষ্যত্বেরও চাহিদা মেটাতে হবে। মানুষ হিসাবে যে খাটো সে কি মানুষের ছেলেকে মানুষ করতে পারে! আর এই মানুষ করার কথাটাও উনবিংশ শতাব্দীতে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্গত ছিল ও প্রায়ই শোনা যেত। বিলেতের ডাক্তার আরনল্ড প্রমুখ প্রধান শিক্ষকরা বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বকেও যে গুরুত্ব দেন বাংলার রাজনারায়ণ বসু, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ প্রধানশিক্ষক তথা অধ্যাপকরাও সেই গুরুত্ব দেন। আধুনিক শিক্ষা বিদেশ থেকে আমদানি করার সময় কিছু পরিমাণে মনুষ্যত্বও আমদানি করা হয়েছিল। সেটা ধীরে ধীরে ক্ষয়ে এসেছে বলে ভয় হয়। নইলে ছাত্রদের এমন আস্পর্ধা হতো না যে তারা মাস্টারদের অশ্লীল ভাষায় গালাগাল দিত, অধ্যাপকদের তুইতোকারি করত।

ছাত্রদের এতকাল নিষ্ঠুরভাবে পেটানো হয়েছে, এবার তাদের হাতে পিটুনি খেতে হচ্ছে। ইতিহাসের পরিহাস। এখন প্রহসনটার বোলকলা পূর্ণ হয় যদি পুলিসকে এর মধ্যে টেনে আনা হয়। অবশ্য না ডাকলেও আসতে বাধ্য তারা। কোথাও অপরাধ অনুষ্ঠিত হলেই পুলিসকে সেখানে যেতে হয় ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এটা মধ্যযুগও নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও গির্জা বা মন্দির নয়। তা হলেও আমি দুঃখিত।

(১৯৭০)